ক্ষিতিমোহন সেনের সম্প্রীতি ভ
াবনা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০ - ১৯৬০), কিন্তু কী এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে সন্তবাণীর মর্মের ভিতরে প্রবেশের পথ খুঁজেছিলেন। পরিচয়ের পরিধি যত বিস্তৃত হয়েছে, এইসব বাণীর নিহিতার্থ ধরা দিয়েছে যত,তত অনুভব করেছেন সমাজের নিম্নস্তরবর্তী নিরক্ষর সাধকদের অশাস্ত্রীয় এই সাধনবাণী শাস্ত্রবাণীর চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয় । গভীর উপলব্ধির আলো - মাখা সেই সব বাণী যে কী আশর্চ্য সজীব ও অতলস্পর্শ তা জেনে দিনে দিনেই আরও বেশি অ াকৃষ্ট হয়েছেন। এর রসসম্পদে নিষিক্ত হয়েছে তাঁর মন।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই দুর্লভ ধন সংগ্রহে ও সানুবাদ সংকলনে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর কবীর ও দাদূর বাণী সংকলন-গ্রন্থ বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত সন্ত-কবির জীবন ও বাণী তিনি শিক্ষিত সমাজের গোচরে এনেছিলেন। তখন এ - সবের চর্চা ছিল না। এমনকী হিন্দিভাষী মহলেও কবীর ও অন্যান্য সন্তদের নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। উত্তর ও উত্তর - পশ্চিম ভারতে এঁদের মূখ্য প্রতিষ্ঠা ছিল সাধকদের হৃদয়ে। কবীরের কথা বলতে সবচেয়ে ভালোবাসতেন ক্ষিতিমোহন, যিনি এই ভারতের মাটিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এদেশে মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক স্তরের সমান্তরালে যে আশর্চ্য গভীর ও উদার ধর্মসাধনার ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল, ক্ষিতিমে াহন বিবরণ দিয়েছিলেন ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা গ্রন্থে।১ এই কালে অসংকীর্ণ প্রেমময় সাধকদের পরিচয় পেয়েছিলেন বলে মধ্যযুগকে বরাবরই ক্ষিতিমোহন দেখেছেন ইতিবাচক দিক থেকে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই সময়টাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলতে তাঁরে আপত্তি ছিল।

বহু শতাব্দীর ঘাত - প্রতিঘাতে আর্য ও আর্যপূর্ব নানা ধরনের সভ্যতা মিলেমিশে বিরাট ভারতীয় সভ্যতার অবয়ব নির্মিত হয়ে উঠেছিল। সমাজে তখন প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য ছিল যে বিচিত্র উপকরনের সমন্বয় প্রক্রিয়া কোনো বাধাতেই থেমে য ায়নি। যখন এই প্রক্রিয়া চলছে তখনও বাহির থেকে নানা জাতি অবিরত আসছে। শক হূন প্রভৃতি জাতি এদেশে এসে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বৈদিক কর্মকাণ্ড যে ক্রমশ উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের দিকে এগোল এবং চিন্ত াশীল ভাবুকরা নিগূঢ় মর্মবাদী হয়ে উঠতে লাগলেন, হয়তো তার মূলে এইরকম বাইরের বিচিত্র সভ্যতা ও চিন্তার আঘাত ছিল। এ মত ক্ষিতিমোহনের। 'তখনও ভারতে শক্তির ও জীবনের লীলা নানা ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।' কিন্তু যখন কালান্তরে এই প্রচন্ডশক্তি হারিয়ে যেতে লাগল, তখন দেশের ধর্ম, তার সমাজব্যবস্থা, তার চিন্তা দৃষ্টি চেষ্টা রাজ্যনীতি সবই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হয়ে এল। 'ইহাই হইল মধ্যযুগ'---একথা বললেও একে অন্ধকার বলতে নারাজ ক্ষিতিমোহন। তিনি দেখেছেন, 'মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সাধনায় ভরপুর। কখনো কখনো এই দুই সাধনায় বিরোধে ঘটিয়াছে, কখনো কখনো মিলন হইয়াছে।' এই মিলনে - বিরোধ যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি - সাধনায় প্রাণবান স্রোতোধারা উচ্ছিত হয়ে উঠেছে, তার সম্পন্নতায় ক্ষিতিমোহন আজীবন মুগ্ধ।

এদেশে প্রাচীনকালে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঔপনিষদিক জ্ঞানকাণ্ডের সমান্তরালে যে একটি ভক্তি সাধনার ধারা বয়ে আসছিল, তার কথাটিও এসে পড়ে। সে প্রবাহ তখন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ক্ষাত্রশক্তি দেখা দিল যোদ্ধৃবেশে। ঐক্যের আদর্শের অভাবে অসংহত হিন্দু সমাজ সংহত এই বহিরাগত প্রচণ্ড শক্তির আক্রমণ বেশিদিন প্রতিহত করতে পারেনি। তখন আর এই বিপুল শক্তিকে আত্মসাৎ করবার মতো জীবনীশক্তিও তার নেই। আর তাছাড়া পূর্বাগত জাতিদের সঙ্গে মৌলিক তফাত ছিল। একটা প্রবল পরাক্রান্ত বিদ্ধ শক্তির প্রতীক এরা। তবু দেখা গেল, 'মুসলমান আক্রর্শমণে তীর্থমন্দির ও নানাবিধ ধর্মক্ষেত্র বারবার বিপন্ন হইল সত্য, কিন্তু ধর্মের প্রধান স্থান হৃদয়মন্দির ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল।' এই জাগরণের অনুকুল আবহ সৃষ্টিতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট জোরালো ভূমিকা ছিল। একদিকে আঘাত ও বিপন্নতার প্রতিক্রিয়ায় ভুলে-যাওয়া, অবহেলা ভরে ফেলে - আসা উচচ আর্দগুলির পুনদ্ধারে হিন্দু সাধকদের সক্রিয় চেষ্টা যেমন দেখালে, অন্যদিকে মুসলমান সাধকদের আদর্শ ও সাধনার নানা ধারা এই চেষ্টার সঙ্গে গভীর ও ব্যাপকভাবে মিশছিল। কোন বিস্মৃত অতীত থেকেই তো এদেশে ফকির - দরবেশ - সুফি সাধকরা নিয়মিত আসা - যাওয়া করেছেন। এখন ক্ষমতাদর্পী ধনলুদ্ধ বিদেশির অস্ত্রবলের প্রচণ্ডতার পাশাপাশি আর এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটল। 'বিদেশ হইতে সব সাধকেরা তাঁদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া সাধনারজন্য ভারতের নানা স্থানে বসিয়া গেলেন। ..... তাঁদের সাধনার পীঠগুলিই এক একটি তীর্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।'কারণ, বহু মানুষ, যারা দেশ - জোড়া আলোড়নে - পরিবর্তনে ভীত লুব্ধ বিচলিত হয়ে এবং বহুতর মানুষ, যার নিজের ধর্ম ও সমাজের দ্বারা আহত হয়ে ধর্মান্তরিত হল, তারা নয়, যারা হৃদয়ের ভাবে তাগিদে নতুন সত্যলাভের ব্যাকুলতায় পথের খোঁজে ছিল, তারা এইসব সাধকদের চারপাশে এসে সমবেত হল। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মুসলমান সাধকরা শুধুই প্রভাবিত করলেন না, প্রভাবিত হলেনও । ক্ষিতিমোহন বললেন, 'ইহাই মধ্যযুগের নব ভক্তিসাধনা ও অধ্যাত্মদৃষ্টির মূলে।' তাঁর কথায়

নবযুগের আরম্ভ হইল। মুসলমানেরাও এই ভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠা, শুদ্ধএক্কেরবাদ, কঠোর সাধনা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্রমে তাহাতে ভারতের রং ধরিতে লাগিল--ক্রমে এই উভয় ভাবের মিলনে মধ্যযুগের ভাবের ঐর্য আবার আশর্চর্যরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

যাঁরা দেশ জয় করে আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁরা কোনোদিন সাধারণ মানুষের হৃদয় অধিকার করতে পারেন না। সেই বাঁধভাঙা বন্যার সময় যেসব নিষ্ঠাবান স্বধর্ম নিরত পরমতাসহিষ্ণু মুসলমান শাস্ত্রপন্থীরা এসেছিলেন তাঁরাও তেমন করে তা পারেননি। যেমন উন্নাসিক হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরাও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছেন। মানুষের হৃদয় জয় করে নিলেন ভাবুক ও সুফিশ্রেণির আধ্যাত্মিকভাবে ভরপুর মুসলমান সাধকেরা। এঁরা সাধরণত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ, শাস্ত্রচারবিমুখ, প্রথাবদ্ধ ধর্মাচারনে অনাগ্রহী। এঁদেরই ঘিরে ভিড় জমালেন যে সত্যসন্ধানীর দল তাঁরাও মুখ্যত সমাজের অন্তেবাসী, নিরক্ষর। এই স্তরে সাধক এবং সাধনার্থী অনায়াসে সংযুক্ত হতে পেরেছেন অন্তরের টানে। জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি পথরোধ করেনি। এখনও করে না।২ ক্ষিতিমোহনের অন্বেষণের বিশাল পট জুড়ে এখন প্রচুর গু-শিষ্য পরস্পরার ধারবাহিক সন্ধান মেলে, যেখানে জাতি বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট ছাপ মানুষের কোনো পরিচয়ই দেয় না। হিন্দু গুর মুসলমান শিষ্য, মুসলমান গুর হিন্দু শিষ্য, নমঃশূদ্র বাউল সাধকের ব্রাহ্মণ শিষ্য তিনি তাঁর নিজের জীবনেই বহু দেখেছেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন

তখনও যে ভারতে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির অভাব ছিল তাহা নহে। তখনও উচচশ্রেণীর চিন্তাশীলেরা ন্যায় দর্শন শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ চিন্তায় তাঁহাদের অসাধরণ চুলচেরা বিশ্লেষণ - ক্ষমতায়জ গৎকে চমৎকৃত করিতে পারিতেন---কিন্তু অভাব ছিল যথার্থ জীবনের যোগদৃষ্টির ও মহান আদর্শের ।তখন আদর্শ দৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ও সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

সহজ ঔদার্যে ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় সেই যোগদৃষ্টির অধিকার অর্জন করেছিলেন মধ্যযুগের নবব্রতীর দল এবং ত ার মধ্যে, 'ধর্মসাধনায় উদারতার ক্ষেত্রে সকলের সেরা হইলেন কবীর।' ----বলেন ক্ষিতিমোহন। সন্ত কবীরের ৩ মতে, 'যে সাধক সম্পদায়ভেদ না মানেন সেই সাধকের মতই প্রশস্ত।' তাঁর উপদেশ হল, 'সম্প্রদায় বুদ্ধি রহিত হইয়া নির্ভয় হও।'

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা এইসর নিরক্ষর সাধকরাই বললেন। পণ্ডিতরা তা পারেননি। 'পঢ়ি পড়ি সো পত্থর ভয়া লিখি লিখি ভয়া জো ঈঁট' ---শাস্ত্র পড়ে পড়ে পণ্ডিতরা পাথর হলেন, লিখে লিখে হলেন পোড়া ঝামা। তাই তাঁদের দিয়ে মিলনের কাজ অসম্ভব, সে কাজ পারবে সহজ মুর্খের দল। 'ঈঁটা ঈঁটা আগে হৈ কাদো কাদো লাগ'---ইঁটে-- যোগদৃষ্টি ব াংলার বাউলদেরও। ক্ষিতিমোহন বলেন, 'বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু -মুসলমান কোনো ভেদই নাই।' আবার বলেন 'হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছে।' অভেদসাধন ঘটেছে এঁদের প্রেমের মন্ত্রেই।

বলা বাহুল্য, তেমন মানুষ আর ক'জন । মধ্যযুগে নব সাধনার পথে মানুষের আহ্বান যেমন এসেছে, সামন্তরাল ভেদবাদী সংকীর্ণমনা ধারাটা তেমন সর্বদা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সে আহ্বানের স্বরটুকু ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। সেই কালের পটভূমিতে কবীরের মূল্যায়ন--প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, 'ভারত যখন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়রে ঝগড়ায় খণ্ড খণ্ড হয়ে রয়েছে, তখন এই নিরক্ষর জোলার পুত্রটি কেবল আপনার সাধনার বলে কী করে যে অখণ্ড দৃষ্টি পেয়ে সবঝগড়ার উপরে উঠে গেলেন তা বলাই অসম্ভব।' এই অখণ্ড দৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর ভালোবাসা।

সকল সম্প্রাদায়েরই অসম্পূর্ণতাকে বাদ দিয়ে তার ভিতরের মর্মটি তিনি ঠিক ধরে নিতে পেরেছেন আর প্রেম দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরেছেন। অথচ চলতি সম্প্রদায়গুলোর বাইরের আবর্জনার উপর তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত করেছেন তা পড়লে মনে হয় যে কী প্রচণ্ড আঘাত করবার শক্তিই তাঁর ছিল।
এই কথাটার সূত্র ধরে ক্ষিতিমোহন বলেছেন আরও কবীর ভক্ত ও সাধক। তিনি জানেন ধর্ম প্রেমের জিনিস, প্রাণের জিনিস । ধর্মকে তো যুক্তির চাপে ঠেসে এককরে দেওয়া চলে না। তিনি দেখলেন সব ধর্মের অসত্য আবরণ আবর্জনা যদি দূর করে ফেলা যায় ও তার বিশেষত্বটি প্রাণ-মন দিয়ে সাধন করে ফুটিয়ে ওঠানো যায়, তবে ধর্মের পার্থক্য থাকে বটে, কিন্তু তাতে ধমের্র সঙ্গে ধর্মের যথার্থ মিলটি ফুটে ওঠে। ....তাই কবীর বললেন প্রত্যেক ধর্মেই সত্যটুকু রাখতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে ভারত একটা ধর্মের জঙ্গল। আজও তো এখানে একের সঙ্গে অন্যের মিলন অসম্ভবই বোধ হয়। অথচ সেই মধ্যযুগে, 'কবীরের প্রতিভাদৃষ্টিতে এই সত্যটাই প্রকাশ পেল যে ভারতই সব ধর্মের সমন্বয়ের প্রধান ক্ষেত্র' এবং এটাই ভ ারতের সাধনা। 'ধর্মের সঙ্গে ধর্মের এইযে প্রেমের মিলন---আপন আপন বিশেষত্ব রেখেও যে বিচিত্র সমাবেশ', কবীর এই সাধনার নাম দিয়েছিলেন 'ভারতপন্থ'। তাঁর কাঙ্ক্ষিত এই ধর্মসমন্বয়ের কথাটা সহজ করে বোঝাতে ক্ষিতিমোহন কাশীতে দীপাবলির দিনের আলোকসজ্জার উপমা দিয়েছেন। সে উপমা কবীরেরই।

কাশীতে কবীরের জন্ম । সেখানে এক এক দল ও সম্প্রদায়ের এক এক ঘাট। এক এক প্রদেশ ও মন্দিরের এক এক ঘাট। দীপালির দিন যার যার ঘাট দীপাবলি দিয়ে সাজায়। তাতেই গঙ্গাতীরটি দীপালির রাত্রে অপূর্ব রমণীয় হয়ে ওঠে। এমনি করে সব রকমের ধর্মসাধনার দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠলে সকলের উজ্জ্বল শিখায় ভারতের দীপালি পূর্ণাঙ্গ হবে।

এই আশা কবীরের। তাঁর আশা যে তাঁর ধর্মবংশে এই ভারতপন্থের সাধনা চলতে থাকবে, এই সাধনার দীপান্বিতা সাজ াবে ভারত। কবীরের দেওয়া আরও নানা উপমা মনে আসে ক্ষিতিমোহনের। সব ভারত পথিকের সাধনার জোরে গতি প াবে জগন্নাথের রথ, সব জাতির লোকের হাতের টান পড়বে রথের রশিতে। সব সাধনার ফুলে একগাছি মালা গেঁথে পুযে

াত্তমের গলায় পরাবে ভারত। কখনো আবার কবীর বলেন সব ধর্মেব মিলনে সাধন-কমলটি ফুটে ওঠার কথা। সেটি ফুটল না বলে ভ্রমর নিরাশ হয়ে ফিরেছেন। 'জগৎস্বমী তো ভ্রমর হয়েই রসভোগ করতে চাচ্ছেন। তাঁর তৃপ্তি হরে কবে ? তাঁর পিপাসা কবে মানব মেটাবে?'

এ তো অনেক দূরের কল্পনা । আশঙ্কা হয় বিদ্ধ শক্তির প্রবল তাপে সরোবরটাই শুকিয়ে যাবে বুঝি। কমল ফুটবে আর কে াথায়। কি সেকালে কি একালে ধর্ম ব্যবসায়ীর দল কখনো ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে - সম্প্রদায়ে মিলতে দেয়নি,দেবেও না। ত াই তো বাউল গানে বলেন
তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই,
ইখ্যা দাঁড়াই গুতে মোরসেদে।
কবীরের ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ । গু - মুরশিদের স্বয়ং ভগবানও ভয় করেন। 'কিরতনিয়া সে কোন বিস সন্ন্যাসী সেঁ তীস' --- কীর্তনীয়াদের কাছ থেকে বিশ ক্রোশ দূরে থাকি, সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে থাকি ত্রিশ ক্রোশ দূরে।

নানা পথে মানুষকে বোঝাতে চাইতেন কবীর। বলতেন, 'তীর্থে তো কেবল জল, স্নান করে দেখেছি কিছুই হয় না। প্রতিমা সব তো জড়, ডেকে দেখেছি সাড়াই দেয় না। পুরানে কোরানে সব কথাই সার। এই ঘটের (আত্মার) পরদা খুলে দেখেছি। কবীর কেবল প্রত্যক্ষ অনুভবের কথাই বলেন, আর সবই মিথ্যা , সে দেখাই গেছে।' কখনো মানুষের নিরর্থক প্রাণহীন ধর্ম াচরণ দেখ রাগ করে বলেছেন, 'কহৈ কবীর জো প্রেমসে বিচুড়ে তাকো নরক নিদান।' কখনোবা নিরাশ বেদনার্ত কণ্ঠ শোনা গেছে তাঁর
কিতনো মনাবো পাঁর ধরি কিতনো মনাব রোয়।
হিংদূ পূজৈ দেবতা তুর্কি না কাহূ হোয়।
'কত না তাদের পায়ে ধরেই আমি বুঝিয়েছি. কত না চোখের জলেই বুঝিয়েছি। হিন্দু তার দেবাতার - পূজাকরবেই, আর মুসলমান কারও আপন হবেই না।'

'হিন্দু ও মুসলমান দুয়েরই হাত ধরে যখন কবীর তাদের বোঝাচেছন তখন দু-দলই সমানভাবে তাঁর উপর খড়গহস্ত' বলে যখন কবীর সাখী উদ্ধৃত করেন ক্ষিতিমোহন, তখন কালের দুস্তর ব্যবধান পার হয়ে আমরা বেশ সহজেই বুঝতে পারি কোন আঁধির প্রকোপে পড়ে কবীরের ভারতপন্থ পথ হারাল। সে আঁধির প্রকোপ তো এখনও কমেনি। কবীর বলছেন, 'দেখো ভ াই, জগৎটা পাগল হয়ে গেছে। সত্য য়দি বলো তো মারতে আসবে, অথচ মিথ্যা বললে সে দিব্যি ঝিাস করবে। হিন্দু বলেছেন 'আমরা রাম', মুসলমান বলেছেন 'আমরা রহীম'। পরস্পর লড়াই করছেন, কেউই মর্ম বুঝলেন না। হিন্দুর দয়া মুসলমানের কৃপা দুইই ঘর ছেড়ে পালালো । একজন দিচ্ছেন বলি, আর একজন করছেন জবাই। দু-জনের ঘরেই আগুন লেগেছে। তাঁরা নিজেদের বেশ সেয়ানা মনে করে আমার দিকে উপহাসের মতো একটু হেসে তাকাচ্ছেন। কবীর বলেন, ভ াই বলো দেখি আমাদের মধ্যে পাগল তবে কে ?'

এমন নানা ভাবে কবীর-পদ ছড়িয়ে থাকে ক্ষিতিমোহনের লেখায়। সন্ত দাদূর ৪ সমতল পদও অনেক এসে পড়ে, আসে রজ্জব প্রমুখের পদ। বাহুল্যভয়ে তাঁদের পদের উল্লেখ এই প্রবন্ধে আমরা খুব কমই করতে পারব। কবীর বলেন, 'খোদ যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জগৎটা কার ? তীর্থে - মূর্তিতেই আছেন যদি রাম, তবে বাইরেটা দেখে কে ?' সম্প্রদ ায়ের বেড়া দিয়ে যে সুরক্ষিত করা যায় না, তাতে বরং উলটো বিপত্তি এসে পড়ে তাঁর লেখায়--- 'বাইরের গ - ছাগলের ভয়ে খেতে বেড়া দিলাম, দেখি বেড়াটাই খেত খেয়ে উজাড় করে দিল। 'ব্রেহা দীনহী খেতকো ব্রেহাহী খেত খায়।'

যে যাই বলুক, বাস্তবে, 'সব দলের লোকই আপন আপন দলপতির পিছনে চলেছেন।' 'অপন অপনে সিরোঁকো সবন লীন

হৈ মানি।' কাজেই 'আপন আপন দলের আগুনে সবাই বিনাশ পাচ্ছেন।' কবীর দুঃখ করে বলেছেন, 'এমন জীবন তো মিলল না যাকে বুকে চেপে ধরে বুখ জুড়াই।'
আর দাদু বলছেন দীর্ঘস্বাস ফেলে
খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকৌ পখি পকি লিয়া বাঁটি
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বংধে ভরম - কী গাঁঠি।
ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে নানা সম্প্রদায়ে ভাগ -জোক করে নিল। পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করে বদ্ধ হল ভ্রমর গাঁঠে।
দাদূর শিষ্য রজ্জবজি । ক্ষিতিমোহন বলেন তাঁর উদারতার তুলনা নেই। তাঁর কথা হল সাম্প্রদায়িক সত্য বলে কোনো সত্য নেই। জগতের সব সত্যের সঙ্গে যে সত্য খাপ না খেল, তা মিথ্যা--- 'সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ না মিলে সো ঝুঠ।'
সমান দাপটে রজ্জব বলেন
চৌরাশী লক্ষ সংপ্রদা করি ঝিস্তর সোয়।
রজ্জব বৈচিত্র্য রচিয়া জন জন বৈচিত্র হোয় ।।
চুরাশি লক্ষ সম্প্রদায় --- যত জীব তত সম্প্রদায় । রজ্জব বলেন প্রত্যেক জীবের বৈচিত্রের মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ বিচিত্র লীলা।

বড় আশর্চ্য মনে হয় । সেই সেকালের মানুষ রজ্জব কী অনায়াসে বলছেন যত মানুষ তত সম্প্রদায়। ব্যক্তি মানুষের অত মূল্য তো একবিংশ শতাব্দীও স্বীকার করতে পারছে না। বরং বিপরীত দেখি যেন, য়ে ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য যুগ যুগান্তর ধরে সাধনা চলেছে, আজ যেন সমষ্টির প্রাবল্য তাকেশ্বাসরোধ করে মারতে উদ্যত। নানাদিক থেকে মধ্যযুগের এই অঝিাস্য ঔদার্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই ক্ষিতিমোহন বলতে পারেন 'মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার প্রধান গৌরবের কথা হইল মানব - মনের ধর্মচিন্তার স্বাধীনতা।' সেই মানবিকতায় কবীর বলেন, 'বহতা পানী নির্মলা বংধা গঁধীল া হোয়'---- সাধক কখনো বদ্ধ জল হবেন না, হবে বহমান নদীর মতো। কবীরের কথা শুনে চিন্তায় পড়ল লোকে। সাধকরা যদি কেবলই চলেন তবে স্থিতি আসবে কেমন করে । তাঁদের র্ধমাদর্শকে ঘিরে সম্প্রদায় না গড়লে তো ধর্মাদর্শ রক্ষা করা যাবেনা উত্তরে কবীর দ্বিধাহীন। এক তো তিনি অভিজ্ঞতায় দেখছেন 'ব্রেহা দীনহী খেতকে ব্রেহাহী খেত খায়'---- সম্প্রদায় হল সাধনা রক্ষা করতে। সেই সম্প্রদায়ই খাচ্ছে ধর্মকে । আর তাঁর অন্য যুক্তির কথাটা আরও মারাত্মক, বিদ্ধ পক্ষ আর প্রতিবাদের ভাষা
হীরা কী ওবরী নহী মলয়া গির নহী পাঁত।
সিংহোকে লেহংডা নহী সাধু ন চলেঁ জমাত।।
'হীরা যেমন খনিতে এক জায়গায় একরাশ জন্মায় না, মলয় পর্বতের যেমন পঙ্‌ক্তি নেই, সে একটা দাঁড়িয়ে থাকে, সিংহের যেমন পাল হয় না, সাধুও তেমন দল বেঁধে চলেন না।'
গভীর ঝিাসে কবীর বলছেন, 'যহ তো ঘর হৈ প্রেমকা...,' 'এই ঝি হল প্রেমের ঘর।' সেই প্রেমের ঘরে অমরলোকের বার্তা নিয়ে এসেছেন তিনি। যেখান হতে এসেছি আমার সেই দেশ। সেখানে না আছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, না আছে সেখা। সেখানে না আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু, না আছে মহেশ। না আছে সেখানে যোগী জঙ্গম দরবেশ। কবীর বলেন সেখানকার বার্তা আমি এনেছি। কী সেই বার্তা ? 'সার সুরটি গ্রহণ করে সেই দেশে চলো।' সুরের কথাটা প্রায় এসে পড়ে কবীরের রচনায়। এই বিশ্বের এক বীণাযন্ত্র। কখনো আবার বলেছেন এই ঝি তাঁর গান। আমাদের জীবনকেও পরিপূর্ণ সুর কর তুলতে হবে। ঝিব্যাপ্ত বিরাট সুরের সঙ্গে জীবনের ছোট সুরটি মেলানোই আমাদের সাধনা। সুব মেলানোর কথা বলতে বলতে চারপাশের বিদ্বেষ -- বিভেদ - সংকীর্ণতার বাধায় ঠেকে বেদনার্ত হয়ে ওঠে কবীরের মন
কবীরা জংত্র ন বাজঙ্গ টুটি গয়া সব তার।
জংত্র বিচারা ক্যা করৈ চলা বজাবনহার ।।
'হে কবীর, বীণা তো বাজল না, সব তার কেবল ভেঙেই চলেছে। যন্ত্র বেচারা আর করবে কী ।
যিনি এই যন্ত্রে তাঁর সুরটি বাজিয়ে তুলবেন তিনিও নিরাশ হয়ে চললেন।' বেদনা - দীর্ণ অন্তর বিলাপ করে , তবু আশা

সঙ্গ ছাড়ে না। ক্ষিতিমোহন সেই কবীর--- সাখীটি শোনান, তাঁর চরম আশা যেখানে ব্যক্ত হয়েছে। সেআশা যদি পূর্ণ হয় কবীর আর নিজের জন্য নির্বাণ - মুক্তি চান না।
আমি এই দেখতে চাই যে মানবের সকল পথের সকল সুরের মিলনে মানব - বীণার তার 'হুজীরী' রাগে বাজছে । জাতির মন্দিরে জাতির আতিথ্য চলছে---মানবের মন্দিরে নিখিল মানব - জাতির অভ্যর্থনা হচ্ছে। এ যদি দেখি , তবে আর আমি নির্বাণ চাই না, সিদ্ধি চাই না। বারবার যেন এই মহা-মহোৎসব দেখতে এই মানব জগতে আসতে পাই। জন্মে - জন্মেই যেন এই অপরূপ লীলা দেখতে পাই।

হায়রে, কবে কেটে গেছে কবীরের কাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল। হিন্দু এবং মুসলমান এবং আরও বহুতরসম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করে এল ভারতের মাটিতে। সর্বদাই যে খুব শান্তিতে বাস করল তা নয়, ঔদার্যে ও সম্প্রীতিতেও নয়। বীণা ভেঙেছে বারে বারেই। যাঁকে উপলক্ষ করে মানুষ দেবালয় নির্মাণ করে, নির্মাণ করে মসজিদ, উপাসনা গৃহ, তিনি যুগ যুগ ধরে তার বাইরেই প্রতীক্ষা করে রইলেন, ভিতরে আর প্রবেশ করা হল না তাঁর। কবীর তাই বলেছেন, 'জীব - মহল মে সিব পহনবা কহাঁ করত উনমাদ রে'----মানবমন্দিরে অতিথি শিব এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তোরা সব কোথায় দাঁড়িয়ে পাগলামি করছিস ? তবু তো এই সত্য - ভোলানো উন্মত্ততার মধ্যেও কতবার কত ব্যক্তি- মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াসে সম্প্রদায় - নির্বিশেষে পারস্পরিক সাধনা পুষ্ট হল। তাঁরা একে অপরের থেকে যা গ্রহণ করলেন, স্বীয় অনুরাগে রঞ্জিত করে নতুন রূপ দিলেন তার। সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে, ক্ষিতিমোহনের জীবন যখন সত্তরের কোঠার দিকে অনেকটাই এগিয়েছে, দেশ বিভাজনের মূল্যে দেশে স্বাধীনতা এল। তার আগে এবং পরে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আলোড়িত ভারতে ক্ষতবিক্ষত ভয়ার্ত চেহারা তাঁদের বার বার দেখতে হয়েছে। পরদেশ হয়েছে স্বভূমি । পূর্ববঙ্গের পৈত্রিক ভিটায় আর কোনোদিন তাঁর যাওয়া হয়নি। তা নিয়ে অন্তত প্রকাশ্যে ক্ষোভপ্রকাশ করতে দেখি না ক্ষিতিমোহনকে, মনও সেই পুরনো বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে থাকে যে বিদ্ধে শক্তির সহস্র কুপ্রভাব সত্ত্বেও এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ঐক্যের বোধকাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। ভারতীয়ত্বের মূর্তিখানা সেই বোধের সৃষ্টি। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর গ্রন্থ ভারতে হিন্দু - মুসলমানের যুক্ত সাধনা। হয়তো সেই প্রাকস্বাধীনতা পর্বের অনৈক্যের বিষজর্জর আবহের অভিঘাতে এই হাতিয়ারটাই হাতে তুলে নেবার কথা তাঁর মনে হয়েছিল। মনের কথাটা যেন দেখ হে ভারতবাসী, যখন হিন্দু- মুসলমানে মিলতে পেরেছিলাম, কী দিতে পেরেছি।তাজগহল সৃষ্টি করেছি উভয়ে মিলে---পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য।৫ হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মেই যে আশ্চর্য উদারতার বাণী উদগীত হয়েছিল, তারই আলোচনা দিয়ে এ গ্রন্ত আরম্ভ করেছেন ক্ষিতিমোহন। প্রস্থবনায় বলেছেন, দেহের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া মানুষ মানুষে প্রায়ই যে-সব বিরোধ উপস্থিত হয় আত্মার আত্মীয়তা দিয়ে সেই-সব বিরোধের অবসান ঘটে। আমাদের রাষ্ট্র ও অন্নবস্ত্রের তাগিদে মানুষ মানুষে যে বিরোধ জাগে প্রেমে ও ধর্মেই শান্ত হইবার কথা। তাঁর প্রিয় মধ্যযুগে ধর্ম সাধনায়, সাহিত্য - চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-সংগীত -জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার যে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল এই দেশে, স্থাপিত হয়েছিল আত্মার আত্মীয়তা, ক্ষিতিমোহন তার পরিচয় দিলেন. বললেন ভারতের মধ্যযুগের মোল্লা-পণ্ডিতের দল যখন বিবাদ করিয়া মরিতেছিল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল সাহিত্য -কলা - সংগীতে সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সাধনা।

সংগীত প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন অনেক সময়ই মধ্যযুগকে অতিক্রম করে অনতি আধুনিক ও আধুনিক যুগকে স্পর্শ করেন। তাঁর বই পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এক পরিকল্পিত সুবৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার পড়ছি। অনেক কথা সংক্ষেপে বলছেন, ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও য়ে এক মহা-ভারতীয়, ধর্ম--সংস্কৃতি - শিল্পচর্চার ইতিহাস কথা বলে এই বইয়ে, তা শুনতে শুনতে কথা হারিয়ে যায়। অনাধুনিক সেকেলে সেই কালের আশ্চর্য সমৃদ্ধি দেখেশুনে মনে প্রশ্ন আসে বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর আত্মপ্রচারপরায়ণ 'প্রগতি'--র চোখ ধাঁধানো আলোয় আমরা পথ হারাইনি তো।

মিলিত ধর্মসাধন ধারার প্রতিনিধি স্থানীয় সাধকদের কথা বলেন ক্ষিতিমোহন, আর বলেন কবি, সংগীতকার, স্থপতি ও চিত্রশিল্পীদের কথা। তাঁর লেখায় ধরা পড়ে, 'হিন্দু--মুসলমান সাধনা এ দেশে এমন যুক্ত হইয়া গিয়াছে যে (সাধকদের) রচনা দেখিয়া লেখক হিন্দু কি মুসলমান তাহা বলা অসম্ভব। দরাফ খাঁর রচিত সংস্কৃত গঙ্গাস্তব তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও নিত্য পাঠ্য।' আবার তুলসী সাহেব হাতরসী,৬ যিনি বেদপরায়ণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে যান, 'তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয় যেন মুসলমানেরই লেখা।' তুলসীসাহেব বলেন 'ওরে কিতাব কোরান বৃথা মর খুঁজিয়া, অলখ আল্লা খোদা কোথায় পাইবি সেখানে ? আকাশ - পৃথিবীর মাঝে কোন ঠাঁইয়ে কোন মসজিদে তাঁহার বসতি ? প্রতিক্ষণে রোজ নামাজ ডাক দে, খোদার মিলনের সন্ধান এখনও যে মেলে নাই।' 'রোজ নিমাজ বাংগ অংতর মার্হী'----'রোজ নামাজ নামাজের জন/ডাক সবই অন্তরের মধ্যে।'

সংগীত - পরিমণ্ডলের জ্ঞাণী - গুণী - কলাবন্তাদের বহুজনের পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে আসছে এই গ্রন্থে। ক্ষিতিমোহন দেখিয়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী সুরের টানে এক এক সংগীত শাস্ত্রীর পদমূলে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এসে বসেছেন। সুযোগ্য শিষ্য ও প্রশিষ্যদের পরম্পরা ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য উত্তরাধিকার বহন করেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদ এই পরম্পরায় কখনো ছেদ ঘটাতে পারেনি।

কিংবদন্তী গুণীশ্রেষ্ঠ তানসেনের কথা বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন যেন ভারতীয় সমন্বয়ী আদর্শের চরম সিদ্ধির কথাটি খুঁজে পান । তাঁর ধ্রুপদ-ভৈরবে বাঁধা মহাদেব - বন্দনা, ললিত রাগে বাঁধা গায়ত্রী-বন্দনা উদ্ধৃত করেন। তাঁর রচিত সরস্বতী-বন্দনা উদ্ধৃত করে বলেন, 'দীপাবলীর উৎসবে মিঞা তানসেন বংশীয়েরা স্বহস্তে গৃহপ্রাঙ্গণ গোময় লিপ্ত করিয়া সরস্বতী পূজায় বসিয়া এই ধ্রুপদটিই গান করেন।' সমান অনুরাগে তানসেন মুসলমানি ভাবে পদও রচনা করেছেন, তারও একটি উদ্ধৃত হয় ক্ষিতিমোহনের রচনায় 'তু অব যাদ করলে বন্দে অপনে অল্লাহ কো।'

জন্মসূত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণ তানসেন, পরে সুফি ফকির ঘৌসের কাছে দীক্ষা নিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। আর বজীর খাঁ কর্মসূত্রে মুসলমান। তাঁর সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লেখেন 'বজীর খাঁ সংগীত ছাড়াও শ্রদ্ধার সহিত যোগশাস্ত্র পুরাণাদি গীতা রামায়ণ মহাভারত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত যে-সব গীতিনাট্য (opera) আছে তাহা অভিনয় করাইয়া দেখিলে লোকে ইঁহার গীতশক্তি বুঝিতে পারিবেন। ইনি ভক্তদের কাছে বৈষ্ণব সাহিত্য শিখিয়া ব্রজভাষায় ভালো কাব্যও রচনা করেন।'
আরও কত মিশ্রণ ও সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত শোনান ক্ষিতিমোহন । ধর্ম ও সমাজের লক্ষণরেখা-- ডিঙানো আরও এমন কত রসিক--প্রেমিক - সাধক চিত্তের খবর দেন। সৃজনশীল গুণীদের পাশে কখনো বা সংগীতকলার বিশিষ্ট দু-চারজন পৃষ্ঠপোষকের নাম করেন। 'ভারতীয় সংগীতকলায় মুসলমান সাধকদের দানের তুলনা হয় না। তাঁহারা দাণ দুর্দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সংগীত - বিদ্যাকে শুধু বাঁচাইয়া রাখেন নাই, দিন দিন ইহাকে নব নব ঐর্শ্বে মহনীয় করিয়াও তুলিয়াছেন। আলাউদ্দীন খিলজী, অকবর, জৌনপুরের সুলতান শর্কী, মহম্মদ শাহ রংগীলা, নবার কল্‌বে অলী, নবার বজীদ আলী প্রভৃতি বাদশা-নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না।' এই সঙ্গেই গোয়ালিয়র ও রেওয়ারহিন্দু রাজা মানতোমর ও রাজরামের নাম এসে পড়ে। রাজা বাদশাহদের উৎসাহ পেয়ে ধ্রুপদ-খেয়াল কীভাবে শোকগীত থেকে মার্গসংগীতে উন্নীত হল, তার বিবরণ জায়গা করে নেয়। মিশ্ররাগের সৃষ্টিকর্তা গুণীদের প্রসঙ্গ আসে।
ভারতীয় রাগ হিন্দোল ও পারশি রাগ মোকাম মিলাইয়া অমির খস ইমন রাগ সৃষ্টি করেন। হিন্দু - মুসলমান রাগ মিলাইয়া এইরূপ বারোটি যুক্তরাগ তাঁহার রচনা । ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র Kanx-ul-Tuhuf (গুপ্ত ঐর্শ্য) নামে গ্রন্থ ১৩৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। কাশ্মীরের রাজা জৈন-উল-আবেদীন হইতে মোগল বাদশাহের সবাই এক যুক্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছেন।

শুধু মিশ্রণ নয় নির্দ্বিধায় গ্রহণ। একসঙ্গে কাজ করতে করতে গ্রামের মেয়েরা যে সমস্বরে গান গায়, একদিন এক কলাবন্তের শ্রবণকে তেমন গানের সুর মোহিত করেছিল। তিলক কামোদ রাগ সেই বিমোহনের ফসল। ক্ষিতিমোহন বোধহয়

সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছেন সেই কাহিনিটি শোনাতে । রবাবী ওস্তাদ প্যার খাঁ রোজ শেষ রাত্রে উঠে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম ও তার প্রান্তবর্তী বনের দিকে চলে যেতেন নির্জনে ধ্যানের অভিপ্রায়ে। একদিন, রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন, আভীর পল্লির পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রামকন্যাদের গান কানে এল প্যার খাঁর। তারা জাঁতায় গম ফিষতে পিষতে গান গাইছে। সে গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে প্যার খাঁ সূর্যোদয় পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। মনে হল এই পল্লিসংগীতে বেশ কয়েকটি রাগ মিশে আছে। 'ইস দেহাতী ধুনমে বিহাগ কামোদ ঔর সোরাট য়া দেশ ঐসে তিন পুরানে শাস্ত্রী রাগোঁ কা বড়ী সুন্দর ম্লিাবট হৈ।'
সুরটি গুনগুন করতে করতে ঘরে ফিরে নিজের রবাব যন্ত্রে সে সুর তুললেন প্যার খাঁ। ক'দিন একনাগাড়ের চলল সেই নতুন পাওয়া সুরের সাধন। তারপর দরবারে শুনিয়ে চমৎকৃত করে দিলেন সকলকে। সেই নব রাগের নামকরণ হল তিলক কামোদ।
এঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র শাদিক অলী সংস্কৃতে এমন কৃতী ছিলেন যে লোকে তাঁকে পণ্ডিত বলত। এদিকে সংগীতের শাস্ত্রের সর্বকলার ধ্যানী গু, আবার তাঁরিই সংস্কৃত উচচারণ এবং তাঁর গাওয়া গীতগোবিন্দের পদ শুনে বাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হয়ে যেতেন।

ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের উৎসাহে রসবিলাস, প্রেমচন্দ্রিকা-র মতো বৈষ্ণব রসগ্রন্থ রচিত হয়। বিহার সতসই - এর একটি সংস্করণ নিজে সম্পাদনা করেন। এই মানুষটির উৎসাসে মির্জা খাঁ ইবন ফখদ্দীন মহম্মদ পারসি ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে বিরাট কোষগ্রন্থ রচনা করেন, তুহফতুল হিন্দ্ তার নাম। আরও অনেক গ্রন্থের পরিচয় দেন ক্ষিতিমোহন, বিশেষ করে যেগুলি ব্যতিত্রমী ধরনের। যেমন, তুহফতুল হিন্দ্-এর কিছু আগে লেখা রাগদর্পণ। গ্রন্থ নাম সংস্কৃত, কিন্তু পারসি ভাষায় লেখা বই। লেখক ফরিকউল্লা। (আসল নাম সৈফউদ্দীন মহমুদ)। দারাশিকোর অনুবর্তী ছিলেন বলে ঔরঙ্গজেব তাঁকে গোয়ালিয়রে বন্দি করে রাখেন। সংগীত ও রাগশাস্ত্রের অনুরাগী ফরিকউল্লা। সেইখানে বন্দিদশা ভোগ করতে করতে রচনা করেন রাগদর্পণ। ক্ষিতিমোহনের দৃষ্টিতে 'ইহা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশদভাবে লেখা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র।'
স্থানাভাবে এই বইয়ে হিন্দু সাধক - সংগীতজ্ঞ - সাহিত্যরচয়িতার কথা কমই বলেছেন ক্ষিতিমোহন। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে লেখা অনেক বইয়ের নাম করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ে 'উসুল-এ-সিণা' নামে একটি পারসিগ্রন্থের উল্লেখ করছেন তিনি, যার লেখক হিন্দু, রায় চাঁদ।
আর তাঁর বড় প্রিয় সাধক মালিক মহম্মদ জায়েসী ও পণ্ডিত ও সাহিত্যসাধক আবদুর রহিম খাঁনখানার প্রসঙ্গ। সংস্কৃত সর্বশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি মালিক মহম্মদের। তাঁর উভয় সম্প্রদায়েরই অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন হলেন, ব্রাহ্মণ,নাম গন্ধর্ব্বরাজ। ফকির এবং ব্রহ্মচারী জায়েসী মৃত্যুকালে বন্ধু গন্ধর্ব্বরাজের পুত্রদের কাছে ডেকে নিজের পারিবারিক'মালিক' উপাধি দিয়ে গেলেন। বললেন 'আর্শীবাদ করি যতদিন তোমরা মালিক উপাধি যুক্ত হয়ে ভক্তিতে ভগবানের গুণগান করবে ততদিন তোমাদের বংশে সুকণ্ঠের অভাব হবে না।' ক্ষিতিমোহন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণযোগ করেছেন এরপর 'আজও তাই হলদিয়া ও রায়পুরার কথক ঠাকুরেরা সুকণ্ঠ এবং তাহারা মালিক মহম্মদ জায়েসীর দেওয়া মালিক উপাধির দ্বারাই নিজেদের পরিচয় দেন।' পদ্মাবতী উপাখ্যান অবলম্বনে জয়েসী - রচিত পদুমাবতী কাব্যের কথা তিনি নানা প্রবন্ধেই বলেছেন। 'এই গ্রন্থে যোগমার্গের গভীর সব তত্ত্বকথা আছে।'
জায়েসীর মতে, রানি পদ্মিনী হইল জীবাত্মা, রাজা রতনসেন পরমাত্মা, আলাউদ্দীন পাপ। পাপ আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে হরণ করিতে গেলে পদ্মিনী কিছুতেই তাহা ঘটিতে দিল না, বরং সে আপনাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিল। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুর রহিম খাঁনখানা, মস্ত পণ্ডিত তিনি। কিন্তু এ--সব পরিচয়ে তাঁর আসলেপরিচয় পাওয়া যাবে না। ভক্ত তুলসীদাস ও আচার্য বিট্ঠলের অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি এবং তাঁর বহু রচনার মধ্যে সংস্কৃত কবিতার সংখ্যাও কম নয়। তাঁর বৈষ্ণব ভাবাসক্ত কাব্য শ্রীকৃষ্ণ-রাধা - বৃন্দাবনের ভাবে সুবাসিত । হিন্দু পুরাণের নানা আখ্যান উপমা ও চিত্রকল্পে ধরা দেয় সেখানে। শ্রীকৃষ্ণলীলা নিয়ে মদনাষ্টক রচনা করেছিলেন সংস্কৃত - হিন্দি মিশ্রভাষায়। 'ইহা এখনও হোলির দিনে ব্রাহ্মণেরও অবশ্যপাঠ্য।' -----বলেছেন ক্ষিতিমোহন।

আর একজন, রসখানা পরিচয়ে দিল্লির পাঠান সর্দার, বাদশাহ বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা। কিন্তু এ পরিচয় তুচ্ছ। সব উচচ অভিমান ভেঙে তাঁর ভাবুক চিত্ত যে উদার মাধুর্যে বৈষ্ণবীয় ভাবসাগরে অবগাহন করে, মানুষ তারই পানে চেয়ে বিস্ময় মানে। ক্ষিতিমোহন তাঁর রচনাংশ উদ্ধৃত করেন

মানুষ হৌঁ তো রহী রসখানি
বসৌঁ ব্রজগোকুল গাব্‌কে রাবণ।
জো খগ হৌ তো রসের করৌঁ
মিলি কালিন্দী কুল কদম্ব কী ডারন।।

'যদি মানুষ হই তো যেন বাস করি ব্রজ-গোকুলের গ্রামবাসী গোপ বালক হইয়া । যদি পাখি হই তবে যেন আমি বাস করি কালিন্দীর কূলে কদম্বের ডালে।'

ব্রজভুমির ভাবরসে পূর্ণ এই কবিতা তাঁর স্মরণে আনে, 'আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক... যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল বালক'.....।

ভারতে হিন্দু - মুসলমানের যুক্ত সাধনা গ্রন্থের একটি অধ্যায় গণসাধনা ও গনসংগীত। 'হিন্দু-মুসলমানের সবচেয়ে সহজ ও অপূর্ব যোগসাধনা হইয়াছে বাংলাদেশে বাউলদের মধ্যে'--- বলে এর অধ্যায় শু করলেও ক্ষিতিমোহন লিখেছেন বাউলদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সহজ নয় এবং দিতে গেলে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনাই শ্রেয়।৮ বালার আগমনী দোল নীলপূজা প্রভৃতি উপলক্ষেও বাউলরা গান বেঁধেছেন । অতি জনপ্রিয় সেই সব গানের সূত্র ধরে ক্ষিতিমোহন বললেন

পশ্চিমবঙ্গে যেমন চড়ক পূজায় উৎসব, পূর্ববঙ্গে তেমনই উৎসব নীলপূজায়। চড়ক পূজার মতো নীলপূজাতেও শিব-দুর্গা প্রভৃতির গান হয়। লোকেরা তাহাতে নানা সংবাহির করে। শিব-দূর্গা সাজিয়ে লোকে নানাগান করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা সাধিয়া বেড়ায়। এসব গান-রচয়িতাদের মধ্যে মুসলমান কবিও আছেন। বিত্রমপূরের ধলসত্র গ্রাম এখন পদ্মাগর্ভে। তাহার নিকটে মদন বাউলের এক শিষ্য ছিলেন। মদন বাউলের জন্ম মুসলমান বংশে, তাঁহার শিষ্যবাউলেরও তাই। মদনের শিষ্য শিব-দুর্গার নামে অধ্যাত্মলীলার অনেকগান রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের বাল্যকালে সেইসব নীলের গান আমরা নীলপূজায় গাহিতে শুনিয়াছি। দুর্গাপূজার আগে তাঁরা শুনতেন আগমনী গান। মুসলমান গীতিকার-রচিত একটি আগমনী গান মনে পড়েছে তাঁর। আগমনীতে দুঃখিনী মায়ের অন্তরের কান্নাই শোনা যায়। শরৎকাল। পূর্ববঙ্গের শরৎ। ভরা নদী, ভরা খাল-বিল। সবই আপন আপন ঘরে চলিয়াছে। সকল সময়েই মায়ের মন কাঁদিয়া মরে দূর প্রবাসিনী কন্যার জন্য। প্রতি কন্যাই য়েন গৌরী, সব মাতাই যেন মেনকা। কত নৌকা আসে, কত নৌকা যায়---মায়ের মন ভাবিয়া মরে, এরই কোনো নায়ে যেন বা আমার গৌরী আজ আসিতেছে। হতাশ মায়ের নয়নে শুধু জল ঝরে।

গোলাম মৌলা সেই ব্যথার গানই গাহিয়াছে
গোলাম মৌলা মোছে নয়ন কে-বা দিবো ভাও।
কোন নায়ে বা গৌরী আমার, যায় তো কতই নাও।।

রাজশাহী জেলার ছন ও যোগীর গান, মালদহ পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার গম্ভীর উৎসব রসঙ্গেও প্রায় একই বক্তব্য ক্ষিতিমোহনের। এ সব গানের অনেক রচয়িতাই মুসলমান। অনেকদিন আগে তিনি পূর্ণিয়ার এক গ্রামে এক ভদ্রলোকেরবাড়িতে গিয়ে বোল্‌বাই নামে এক ধরনের গ্রাম্যপালা শুনেছিলেন--'তাহাতে গম্ভীরার শিব-পার্বতীর সব গান। সেই পালা-গায়কদের সব দেখিলাম মুসলমান। গান রচয়িতাও মুসলমান। তাঁহারা সেখানে শেরশাবাদী নামে পরিচিত।'

ক্ষিতিমোহন সেন কাশীর মানুষ। জীবনের প্রথম বিশ-বাইশ বছর সেখানেই কেটেছে। উত্তর ও উত্তর - পশ্চিম ভারতে প্রচলিত বর্ষার গান শোনবার সুযোগ হয়েছিল প্রচুর। দেশের এইসব অঞ্চলে ভয়াল ক্ষ গ্রীষ্মের দাবদাহের পরে যখন বর্ষণের আশীর্বাদ নামে, মানুষজন কজরী বা বর্ষা উৎসবে মেতে ওঠে। সাধকের অন্তরে এই বর্ষণ ধারার আত্মিক তাৎপর্য সুগভীর। ক্ষিতিমোহন দেখেছিলেন, 'এই কাজরী গান অধিকাংশই প্রাকৃত জনের রচনা' এবং এইসব অশিক্ষিত রচনাই

বেশি প্রাণস্পর্শী। 'এই কজরী গানের বহু রচয়িতাই মুসলমান।' প্রকৃতির এই ঋতুগত অবস্থানের সঙ্গে মানব-সাধনার যোগ অতি নিবিড়। বর্ষার মতো বসন্ত সমাগমেও উৎসবের সুর লাগে। তীব্র শীতের পরে যখন স্থলে-জলে - বনতলে বসন্তের দোলা, মানুষের অন্তরে তারই স্পন্দন ভিতরে ও বাহিরে মিলনের উৎসব জাগিয়ে তোলে। ক্ষিতিমোহন বলেন এদেশের মুসলমান কুলে জাত উচচাঙ্গের সাধক-কবিরাও যুগে যুগে হোলিকে ঝিলীলার মধ্যে ও আত্মার অন্তরলীলার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখায় পাই

এতকাল এই উৎসবে গুণী গায়েকের দল সকলেই যোগ দিয়েছেন। ইহাতে তাঁহারা সম্প্রদায় - বিচার কখনো করিতেন না। কাজেই সেই যুগে আমাদের বসন্ত বা হোলির উৎসবটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবি ও কলাবিদগণের যুক্ত সাধনায় রচিত হইত। এই সব মুসলমান কবিদের কেবলমাত্র রসসম্ভোগেরজন্য বৈষ্ণব রসের কবিতায় ও উৎসব উৎসাহ ও সৃষ্টির সাধনা দেখিয়া ইউরোপে বহু খৃস্টিয় কবিদের কলার জন্য পেগান ভাব গ্রহণ করার কথা মনে হয়।

হিন্দুদের সদর্থক ভূমিকা - প্রসঙ্গ সচেতনভাবেই অনালোচিত রাখা হয়েছে। ব্যতিত্রম শুধু জ্যোতিষাদিশাস্ত্র অধ্যায়।ফলিত জ্যোতিষ ভারতবর্ষ পেয়েছিল গ্রিকদের কাছ থেকে। প্রাচীনপন্থীরা বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠেকাতে পারেননি। গ্রিকদের কাছ থেকে নেওয়া এক বিদ্যাই গেছে আরবে, আবার আরবীয় তাজিক হয়ে ভারতে ফিরেছে। 'রমলও মুসলমানের কাছে নেওয়া।' ক্ষিতিমোহন বলেছেন, ভারতীয় সমাজে তাজিক ও রমল সন্মানিত হয়েছে। 'ভারতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও এইসব মুসলমানী শাস্ত্রকে অনাদর করেন নাই' তাজিক নীলকণ্ঠী, রমল নবরত্ন প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের পরিচয় আছে এই অধ্যায়ে, হিন্দু পণ্ডিতেরা যার প্রণেতা বা ভাষ্যকার। ক্ষিতিমোহন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন

কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই অপরের বিদ্যা আপন ঘরে স্বাগত করিতে কার্পণ্য করেন নাই। আবার নিজেদের বিদ্যা যখন পরদেশে গিয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে তখনও তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া বহুদিনে ঘরে - ফেরা সন্তানের মতোই আবার সস্নেহে গ্রহন করিয়াছেন।

বাউল গান করেন 'তোমার অভেদসাধন মরল ভেদে'। যে সহানুভূতি সহৃদয়তা ও প্রীতির টানে অভেদ সাধনের মহারথ চলতে পারে তার অন্বেষণে ক্ষিতিমোহন এক সময় ভারতের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির কয়েক শতাব্দী ব্যাপ্ত ইতিহাসের পথ পরিত্রমা করেছেন। ব্যর্থ হননি। আশ্বাসের বাণী তাঁকে শুনিয়েছেন এ-দেশের আউল-বাউল সাঁই - দরবেশ - ফকির, কবি - শিল্পী-চিত্রী-কলাকারের দল। পণ্ডিতরাও বিমুখ হয়ে থাকেননি।

তবু তো একটা 'তবু'--র খোঁচা সঙ্গ ছাড়ে না। ক্ষিতিমোহন ও নিস্তার পাননি তার যন্ত্রণা থেকে ।তাই যোগের সমন্বয়ের প্রেমের বাণী শোনাতে তাঁর নিজের কালটায় ঘুরে-ফিরেই তাঁর চোখ পড়ে। তখন সেই সেই স্বাধীনতা- সন্নিহিতপর্বের জাতি ও ধর্মীয় বৈরীতার নারকীয় তাণ্ডবের পটভূমিতে দেখায় তাঁকে। কখনো বা তিনি প্রশ্ন তোলেন '..... বহু সুফি সাধক ভারতকেই তাঁহাদের সাধনাভূমি করিয়া লয়েন। এই সুফিরা প্রেম-প্রধান ও অতিশয় উদার ছিলেন। কিন্তু সেইদিন আজ কোথায় গেল ?' কখনো যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ হিন্দু-মুসলমানের উদারতার পথ ও যুক্ত সাধনার পথ আবার কোন সাধনায় মুক্ত হইবে?'

তাঁর অবশ্য পাশ্চাত্যের প্রতি দোষারোপের বেশ একটি প্রবণতা আছে। তিনি বলেন, 'ইনকুজিশনের ইতিহাস আমাদের দেশের নয়। তাহা পশ্চিম দেশের । পশ্চিমই আমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার হইতে শিখাইয়াছে।' আবার বলেন, 'ধর্মের সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব ও আত্মসীমাবদ্ধ ভাবটা হইল বাহির হইতে হালের আমদানি। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দিন দিন যে তাহাকে ক্রমেই উগ্র করিয়া তোলা হইতেছে তাহাই এই দেশের প্রকৃতি বিদ্ধ।'

একালে সব সুস্থবুদ্ধির মানুষই বলবেন শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা। ক্ষিতিমোহনের তো আবার তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের উপর তেমন ভরসা নেই। ইংরেজি শিক্ষার মধ্যেই কোনো সংকীর্ণতার বীজ আছেকিনা, তা নিয়ে মনে একটু সংশয়ও আছে। তাঁর অভিজ্ঞতা বলে, এখনও দেখা যায় খাঁটি আরবী-পারসী শেখা নিষ্ঠাবান মৌলবীরা ন্যায় ও

যুক্তি মানেন। কিন্তু ইংরেজিওয়ালারা কিছুতেই নিজের যুক্তি ছাড়া আর কোনো যুক্তি মানিবেন না । মৌলানা আবুল কাল ামের মতো লোক ইংরেজিওয়ালাদের মধ্যে দুর্লভ। আবার খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যদি বুঝানো যায় তবুও ইংরেজিওয় ালা ও ইংরেজদের চাকুরিয়াদের বুঝানো অসম্ভব।

অল্পাধিক পঞ্চাশ বছর আগে ক্ষিতিমোহন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে যে - কথা বলেন, আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে-কথা মানবেনই এমন নয় হয়তো, সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারবেন কি না, তাও বলা যায় না। স ম্প্রতি ফেয়ারি- মার্চে গুজরাটে সংঘটিত সংখ্যালঘু নিধন দাঙ্গার প্রেক্ষিতে যে সব তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে তাতে শিক্ষিত সম াজের উপরে কোনো আস্থাই আর রাখা যায় না। বর্তমানে তো দেখছি জঙ্গি হিন্দুত্ববাদে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা সব উচচশিক্ষিত মানুষ। মুসলমান সমাজের যাঁরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব তাঁরাও তাই। যে শিক্ষা মনেরঔদার্য বাড়ায় না, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, নিজেদের ব্যক্তিগত উচচাশাকে সফল করতে দেশজুড়ে আগুন জ্বালাতে যার দ্বিধা নেই, বলা বাহুল্য ক্ষিতিমোহনের একান্ত অনাস্থা সেই শিক্ষার প্রতি। তিনি বলেন, অনুভবী সংবেদী মানুষের কথা। মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে গেলে দেশের প্রত্যেক মানুষের চিত্ত জেগে ওঠা চাই। ক্ষিতিমোহন কেবলই শোনান মধ্যযুগের সব আশর্চ্য সংবেদনশীল উদ ারচিত্ত ভাবুকদের কথা, তাঁরা অনেকেই নিরক্ষর । অক্ষরজ্ঞানের অভাব তাঁদের মনের অবাধ সঞ্চরণে-প্রসরণে ও অতল ান্ত ব্যাপ্তিতে কোনো বাধা ঘটয়নি।

বহু পর্যটনে - অধ্যয়নে - অন্বেষণে প্রাজ্ঞ ক্ষিতিমোহন নিজেও ভেবেছিলেন কবীর অনুসারীদের মনেও বুঝি আর ভ ারতপন্থের ভাবনা ঠাঁই পায় না। 'কবীরের পর সে-সব কথা চাপা পড়ে গেল।' কবীরের মতো মহাসাধক, যাঁরা সম্প্রদ ায়ের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন, পরে তাঁদের নামেই কত না সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। যে সংকীর্ণতা এবং আত্মসর্বস্বতা সম্প্রদ ায়ের সাধারণ লক্ষণ, সে সবই তাঁদের আছে। সকলেই, 'লক্ষ্মীবাবুকা সোনা ঔর চাঁদিকা আসলি দুকান' -এর মতো বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তারই মধ্যে ১৯০২ সালে প্রকাশিত একটি সত্য কবীর কী সাথী নামের সংকলনে সংকলক 'ভারত - পথিক' নামে নিজেক পরিচয় দিয়েছেন দেখে ক্ষিতিমোহন বেশ খুশি হয়েছিলেন। কী জানি, একশো বছর পরে ২০০২ অব্দে সেই কবীর পন্থীদের উত্তরসূরীরা ডাণ্ডা হাতে 'মেরা ভারত মহান' বলে সচিৎকারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কি না।

গুজরাট- দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা তথ্যভিত্তিক যে কটি প্রবন্ধ পড়েছি, তাতে এই হতচকিত শঙ্কিত সময়ে দাঁড়িয়ে ভয় হয় ঠিকই, আবার এটুকু জেনে আশ্বস্তও হই যে, অন্তত এখনও পর্যন্ত গুজরাট একটা ব্যতিক্রম, সারা দেশের প্রতিনিধি সে নয়। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে এটাও বিশ্বাস করা যাচ্ছে যে হিন্দু এবং মুসলমান মৌলবাদীদের এত চেষ্টাসত্ত্বেও আজও সংখ্য াগরিষ্ঠ ভারতবাসী চিরকালের মতোই শান্তিপ্রিয় । দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো শতকরা পঁচানব্বই জনেরই ধাতে নেই। এরাই আসল ভারত। পরস্পরকে সয়ে, পরস্পরের কাছে ঋণী হয়ে এতকাল তারা কাটিয়ে এল।

আমার মন এখনও তাই আশ্রয় খুঁজছে ক্ষিতিমোহনেরই কথায় ভারতে যোগ ও যোগীর পরম মাহাত্ম্য। নদীর সঙ্গে যেখ ানে যোগ সেই তীর্থে মুক্তি । মুক্ত (যুক্ত) ও মুক্ত দৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি হয় না। শংকরাচার্য সন্ন্যাসী, তবু তিনি বলিয়াছেন শিব ও শক্তি যুক্ত না হইলে কিছুই হইতে পারে না। ভারতে যখন হিন্দু ও মুসলমান সাধনার মিলন ঘটিয়াছে তখনই নানা ঐর্য সৃষ্টি হইয়াছে। যখনই এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়াছে তখন কেবলই প্রলয় ও সর্বনাশ আসিয়াছে।

ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে তা সে-ই জানে। এই তৃতীয় সহস্রাব্দ বহুকালের প্রাচীন পোড় - খাওয়া মিশ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য প্রলয় ও সর্বনাশ ডেকে আনবে, নাকি তাকে ফলবতী ঐর্যময়ী করে তুলবে, সে জানে আগামী দিনের ভ ারতীয় প্রজন্ম। নতুন কালের ভারতপথিক নব ভারতপন্থের দিশা দেখাবে, এ বিশ্বাস হারাব না। হয়তো এক ভ্রান্তিকাল অ াজ, তাই এত কলরব, এত বিভ্রান্তি। তারই মধ্যে কান পেতে শুনি ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে সুফি - সাধকের পদের উচচারণ

ছোড় ফলক জমী পর আয়া।
অর্শ কুর্সী বীচ মৈঁ না সময়া।। ১০
'সংকীর্ণ স্বর্গে আমি আঁটিলাম না তাই উদার পৃথিবীতে নামিয়ে আসিলাম।'

এই মর্তপ্রীতির কথাই তো রবীন্দ্রনাথের গানে পাই---'আমার লাগল না মন লাগল না, তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলাম চলে....শ্যামল মাটির ধরাতলে।' নতুন নতুন ভাবে-ভাষায় - ছন্দে এমন জীবনপ্রেমের গান না গেয়ে কি পারবে অনাগত কাল ? আর আলম ও শেখের মতো দুই কবির মিলন কি ফিরে ফিরেই নবীন জীবনবোধের জন্ম দেবে না ?
ব্রাহ্মণ আলমের কবিতা কাল ১৬০৩ হইতে ১৭০৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ইনি শেখ নামে এক মুসলমান কন্যারপ্রেমে পড়িয়া মুসলমান হন। জাতিতে শেখ ছিলেন রংরেজ, অর্থাৎ কাপড় রং-করা। শেখেরও খুব উচচদরের কবিতাশক্তি ছিল. আলম তখন কবিতার সব রীতি ভাঙিয়া কাব্য-সাহিত্যে অদ্ভুত নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভারতীয় রসশাস্ত্রে প্রবীণ কবি আলমের পরিচয়টুকুই আছে ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থে, রচনার নমুনা নেই। কবি শেখর অধ্যাত্ম কবিতার একটু নমুনা তিনি তুলে দিয়েছেন। আমার ধারণা পুনশ্চ কাব্যের রঙরেজিনী কবিতার কাহিনিসূত্র রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে। মুসলমান রঙরেজিনী তণীর সঙ্গে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত প্রবরের প্রেম। দিগবিজয়ী পণ্ডিত শংকরলাল, যাঁর শাণিত বুদ্ধি শ্যেন পাখির ঠোঁটের মতো বিপক্ষের যুক্তির উপরে পড়ে বিদ্যুৎবেগে তার পক্ষ ছিন্নভিন্ন করে দিত, রঙরেজির ঘরে পাগড়ি ধুতে দিতে এসেছিলেন। রাজদরবারে দ্রাবিড় নৈয়ায়িকের সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিচার সভা উপলক্ষে জাফরানি রঙে পাগড়িটা রাঙিয়ে দেবোর ফরমাস ছিল। রঙরেজি জসীমের সতেরো বছরের কন্যা আমিনা পাগড়ি ধুয়ে ঘাসের উপর মেলে দিতে গিয়ে দেখলে তার এককোনে লেখা একটি শ্লোকের একটি চরণ---'তোমার শ্রীপদ ললাটে বিরাজে'। বসে বসে সে ভাবল অনেকক্ষণ। তারপর ঘরের থেকে রঙিন সুতো নিয়ে এসে পরের চরণ পূরণ করে দিল---'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'। দিন দুই পরে সেই নতুনরঙে রাঙানো পাগড়ি নিতে এসে শংকরলাল পণ্ডিতের জীবনটই ওলোট - পালট হয়ে গেল। নতুন রঙে রাঙিয়ে গেল মনটাই। চরণ মেলানো শ্লোকটি পড়ে আমিনাকে তিনি বললেন
অহংকারের পাকে ঘেরা ললাট থেকে
নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল----
আর পাব না খুঁজে।
এই তো সেই চিরকালের রসিক - প্রেমিক, হৃদয়ে যার রসের প্লাবন নেমেছে। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অহংকারের বাধা।চিরকাল মানুষ এমন প্রেমে-প্রীতি - সখ্য - সহানুভুতিতে রঞ্জিত হৃদয়ের অপেক্ষায় আছে। তার দেখা পেয়েছেও সেবারবার। যেমন পেয়েছে ভারত। আজও সে তারই প্রতীক্ষায়।

ক্ষিতিমোহন সেনের রচনা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংগুলি পৃথক সুত্র নির্দেশ করা হয়নি। এগুলি প্রায় সবই তাঁর ভারতীয়মধ্যযুগে সাধনার ধারা ও ভারতে হিন্দু - মুসলমানের যুক্ত সাধনা গ্রন্থ ও কবীর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া ।একটি নেওয়া হয়েছে মহাকবি সুরদাস প্রবন্ধ থেকে।

১. এটি তাঁর ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা
২. ফকির - বাউলদের নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করেন তাঁরাই উল্লেখ করেন এ-কথা। খুবই সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তাতে সদ্য বর্তমানের পরিস্থিতির খবর পাওয়া গেল। উপর মহলের ভেদাভেদ আর দলাদলি ওঁদের জীবনচর্যায় ছায়াপাত করে না।
৩. কবীরের সময়কাল ১৩৯৮ - ১৫১৮

৪. দাদুর সময়কাল ১৫৪৪ - ১৬০৩

৫. এ বইয়ে বহু আলোচ্যের মধ্যে তাজমহলের মতো শিল্প - কীর্তিও এসেছে। ক্ষিতিমোহন বলেছেন 'ইহাে
ক ভারতীয় ও অ-ভারতীয় উভয়বিধ শিল্প ও সংস্কৃতির যুক্ত সাধন বলা চলে।' প্রসঙ্গত আর্থার ইউফাম পোপ নামে এক বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্ধৃত করেছেন তিনি। 'ঢব্ধ (তাজ) ought also to regarded as a monument of artistic and intellectual co-operation, the profitable exchange of technique and ideas between kindred cultures, a proof that civilization is a common task, of which the progress depends upon sympathy and co-operation between allied peoples.'

৬. তুলসীদাস হাসরসী জন্ম ১৭৬০ সালের কাছাকাছি।

৭. উভয়েরই সময়কাল ষোড়শ শতাব্দী।

৮. ক্ষিতিমোহন সেনের বাউল - বিষয়ক গ্রন্থ 'বাংলার বাউল'। কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে প্রদত্ত তাঁর লীলা বক্তৃতা।

৯. এইসব ব্রাত্য সাধকদের বর্ষা ও বসন্তোৎসবের গান নিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনের অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। সেখানে বহু গ ানের উল্লেখ পাই । বিস্তারিত আলেচনারও সন্ধান মেলে।

১০. সুফি সাধক শাহ্ লতিফ (জন্ম ১৬৯)। তাঁর শিষ্য সচলের রচিত পদ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com